Episode 14

সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফরাম এর পক্ষে মানস

চরিত্র
অবনী কলেজের শিক্ষক (বয়স ৪৫ বছর)
রাজা ছাত্র (বয়স ২০ বছর)
গীতা ছাত্রী (বয়স ১৯ বছর)
রোহন ছাত্র (বয়স ২০ বছর)
মালা ছাত্রী (বয়স ২০ বছর)
নেহা অবনীর কন্যা (বয়স ১০ বছর)

(একদল ছাত্র ছাত্রী শীতকালে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে পাহাড়ি অঞ্চলে যাচ্ছে। তারা তাদের শিক্ষকের সাথে কিছু আলোচনা করছে। বাসের শব্দ)

রাজা : নভেম্বর মাস
টা যেন ঠিক অনুভবই করতে পারছি না।

রোহন : আগে অক্টোবর মাসে যখন দুর্গাপুজো হতো তখন ভোর বেলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা চণ্ডীপাঠ শুনতাম রেডিওতে।

মালা : হ্যাঁ, এখন আর আমাদের সেই ছটা ঋতু নেই, দুই ঋতুতেই কাজ চালাতে হয় - গ্রীষ্ম আর বর্ষা।

নেহা : বর্ষাকালটাও তো এলোপাথাড়ি ! কখনো আগে আসে কখনো পড়ে আসি। কখনো ঝমাঝম দেয়, কখনও টিপ টিপ।

গীতা : সত্যিই, সব কিছুই একেবারে ঘেঁটে গেছে।

অবনী : বাছারা! জলবায়ু বদলাচ্ছে।

রাজা : স্যার, এমনটা কি শুধু এখনই হচ্ছে, নাকি আগেও ঘটেছে ?

অবনী : আগেও এরকমই ছিল।

রাজা : তাহলে কখন আমরা প্রথম এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ?

অবনী : উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে মানুষ এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। তখন সবে সবে তুষার যুগ আর আরো বেশ কিছু বড়োসড়ো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কথা উঠতে শুরু করেছে। তখনই গ্রীন হাউজ প্রভাবের কথাও সামনে আসে।

রাজা : উ.....নি....শ শতক, বাপরে ! সে তো বহু পুরনো দিনের কথা।

নেহা : (গুনগুন করে) "পুরানো সেই দিনের কথা, হুমমম... হুমম...

মালা : এই চুপ কর। স্যার কী বলছিলেন শোন।

স্যার, কী বলছিলেন ? ওই গ্রীনহাউজ প্রভাব। গ্রীন হাউজ কী ? এটা কি সবুজ রঙের কোনো বাড়ি ?

অবনী : গ্রীনহাউস হলো একটি কাচের তৈরি বাড়ি। এর দেওয়াল কাঁচের। এর ছাদ কাঁচের। এর ভেতরের টমেটো, ফুল আর অন্যান্য বেশকিছু চারাগাছ চাষ করা যায়। আর এর ভেতরটা বেশ গরম। শীতকালেও গরম থাকে।
সূর্যের রশ্মি ভিতরে ঢুকে এখানকার গাছপালা, হাওয়া সবকিছুকে গরম করে তোলে। কিন্তু এই তাপ একবার এর ভিতরে ধরা পড়লে আর বাইরে বেরোতে পারে না। দিনের বেলায় গরম আরও গরম হতে থাকে, আর রাতের বেলাটাও খানিক গরম থাকে।

নেহা : আর গ্রীনহাউজ প্রভাব ?

অবনী : গ্রীনহাউজ প্রভাব হলো একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি যা দিয়ে পৃথিবীর ওপরের তলটা গরম হয়। সূর্যের তাপ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন তার কিছুটা আবার শূন্যে ফেরত চলে যায়। কিন্তু বেশ কিছুটা আবার পৃথিবী শোষণ করেও রেখে দেয়। গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলোও এই শোষণে অংশগ্রহণ করে পরে বিকিরণের মাধ্যমে এই তাপ বের করার জন্য।

গীতা : আর এই শোষিত তাপই পৃথিবী আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে গরম রাখে। এই পদ্ধতিই পৃথিবীর তাপমাত্রাকে গড়পড়তা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরে রাখে, যার জন্য এখানে মানে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল।

রোহন : এই মেরেছে ! আবার ভারি ভারি ব্যাপার স্যাপার আলোচনা শুরু... আমরা নাকি ঘুরতে যাচ্ছি ! এখানেও পড়াশোনা, স্যার ? আমরা বরং ড্রাইভার কাকুকে গাড়িটা একটু সাইডে লাগাতে বলি। কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা করা যাক।

(সবাই হাসল)
যে যে আমার কথা হাসলো তারা জলখাবার পাচ্ছে না।

মালা : তুই ভাগ এখান থেকে। স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ ..

নেহা : গীতাদি, গ্রীনহাউজ গ্যাস কী ?

রাজা : আমি বলছি। গ্রীন হাউজ গ্যাস গুলোর মধ্যে পড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন আর বেশ কিছু কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ যেমন ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন যাকে আমরা ছোট করে সিএফসি বলি।

অবনী : আমাদের বায়ুমন্ডলে উপস্থিত জলও গ্রীনহাউজ গ্যাসের মত আচরণ করে। এই জল তরল বা গ্যাসীয় যেকোনো রুপে থাকতে পারে। যেমন ধরো এই যে মেঘ - এটা তো জলীয় বাষ্প ঠান্ডা আর ঘনীভূত হয়ে এক জায়গায় হওয়া জলের ছোট ছোট তরল কণা। এই মেঘের মধ্যেও কিছুটা সূর্যের তাপ আটকা পড়ে যায়।

রোহন : কিন্তু স্যার গ্রীন হাউজ প্রভাব কীভাবে জলবায়ুকে পরিবর্তন করছে ?

অবনী : প্রাকৃতিকভাবে গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলো উপস্থিত থাকার পাশাপাশি মানুষেরা নিজেদের সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়েও অনেক গ্রীনহাউস গ্যাস প্রকৃতিতে যোগ করে। উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা প্রথম এর প্রমাণ দিয়ে বলেন যে এগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। তাছাড়া আবার আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত আর সূর্যের নিজের গতিবিধির জন্যও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে - এরকম কথাও কিছু বিজ্ঞানী বলে থাকেন।

রোহন : ১৯৯০ এর পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক বেড়েছে এবং এর শাখাপ্রশাখাও অনেক গজিয়েছে।

অবনী : লক্ষ লক্ষ বছরে পৃথিবীতে যেসব প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলো হয়েছে তাদের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী পরিবর্তন।

গীতা : স্যার, কখন থেকে মানুষ প্রথম জলবায়ুর পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করেছে ?

অবনী : সে বহুকাল আগে থেকে। বহু আগে থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এক একটি অঞ্চলের জলবায়ু শতোর্ধ বছর সময়ে পরিবর্তন হয়। এই যেমন ধর না, থিওফ্রেটাস, অ্যারিস্টোটলের এক ছাত্র, বলেছিলেন যে কোনো অঞ্চলের জলাভূমি থাকাতে সে অঞ্চলে শীত বেশি পড়ে, আর কোনো জমি যদি গাছপালাহীন হয়ে মুক্ত সূর্যালোকে থাকে সেই অঞ্চল বেশি গরম হয়।

মালা : রেনেসাঁ আর তার পরবর্তী সময়ের কিছু পন্ডিতেরা দেখেছিলেন যে কীভাবে ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের কিছু অঞ্চলে বিপুল হারে বৃক্ষচ্ছেদন, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে সেখানকার আবহাওয়া কিভাবে পরিবর্তিত হয়।
খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের এক দার্শনিক ভিট্রুভিয়াস লিখেছিলেন মানুষের বাড়ি ঘরের স্থাপত্যের সাথে জলবায়ুর সম্পর্কের কথা। আর তার সাথে এও বাতলে দিয়েছিলেন কিভাবে শহরের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

রাজা : কিন্তু স্যার, কখন এইসব ব্যাপারগুলোকে সিরিয়াসলি নেওয়া হলো ?

অবনী : যখন আঠারো আর উনিশ শতকের মধ্যে গোটা উত্তর-পূর্ব আমেরিকার বনাঞ্চল একধাক্কায় শস্য ক্ষেতে পরিণত হল, তখন থেকে। উনিশ শতকের শুরুর দিক অবধিও অনেকে মনে করত যে এই সকল কারনে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তা হয়তো কিছুটা ভালোর দিকেই হচ্ছে।

গীতা : আঠারো শতকের আগে বিজ্ঞানীরা ধারণাও করতে পারেনি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলবায়ু আমাদের এখনকার জলবায়ুর থেকে কতটা আলাদা হতে পারে। আঠারো শতকের শেষের দিকে কিছু ভূতত্ত্ববিদরা যুগ যুগ ধরে এই জলবায়ু পরিবর্তনের বেশ কিছু প্রমাণ পায়।

রোহন : এই তোদের কারোর খিদে পায় না রে ? ঘুরতে বেরিয়ে কি তোদের সবার পেট অসাড় হয়ে যায় ?

গীতা : স্যার প্লিজ একটু বাসটাকে কোথাও দাঁড় করান। সামনেই মোড়ে একটা ধাবা আছে, আমি জানি। এবার না দাঁড়ালে খিদের ধাক্কায় রোহন পাগল হয়ে যাবে। আমাদেরও যে খিদে পায়নি তা নয়। হে হে !

অবনী : ঠিক আছে, ঠিক আছে..... আমি তোমাদের ড্রাইভার কাকুকে গিয়ে বলে আসছি।

(বাস থামল.. সবাই নেমে হালকা টিফিন করছে)

গীতা : স্যার আপনি কিছু খাবেন না ?

অবনী : না, আমার এখনো সেরকম খিদে পায়নি। বরং তোরা যখন হালকা ফুলকা মুখ চালাচ্ছিস তখন আমি একটা ছোট গল্প বলি শোন। আল্পসের গিরিখাতে বেশ অনেক বড় বড় দৈত্যাকার পাথর রয়েছে।১৮১৫ সালের আগে পর্যন্ত কেউ জানত না ওগুলো ওখানে কিভাবে এসেছে। ১৮১৫ সালে প্রথমবার জঁ পিয়ের পেরাউদ্দিন প্রথমবার এর ব্যাখ্যা দিলেন। দায়ী করলেন হিমবাহকে। তিনি ওই সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করে বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এরকম পাথর দেখেছিলেন। এবং আরো যেটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন তা হল ওই পথ ধরে থাকা লম্বা লম্বা আঁচর। তিনি বললেন হিমবাহ যখন গলতে শুরু করে তখন সেগুলো এই সমস্ত পাথরগুলোকে ধাক্কা দিয়ে নিচে নিয়ে এসেছে। তখন ঐ সমস্ত আঁচর তৈরি হয়েছে। না হলে এত বড় পাথরগুলোকে নড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়।

রাজা : এতে কী প্রমাণ হয় ?

অবনী : এতে এই প্রমাণ হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনা পৃথিবীতে নতুন নয়। ব্যাপক পরিবর্তন আগেও ঘটেছে। না হলে এই বিপুল পরিমাণ হিমবাহ গলবে কেন ?

রাজা : বুঝলাম।

অবনী : ভদ্রলোক অনেক খেটেখুটে এই সমস্ত প্রমান জোগাড় করেছিলেন। তবে প্রথম দিকে তাকে কেউ বিশ্বাস করতে চাইনি। অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ তার কথায় বিশ্বাস করেন। এর উপর ভিত্তি করে তিনি তুষার যুগের থিওরি দেন।

গীতা : স্যার, জলবায়ু পরিবর্তনের আর অন্য কোনো কারণ আছে কি ?

অবনী : তুষার যুগ এবং অন্যান্য সমস্ত জলবায়ু পরিবর্তনগুলোর জন্য অনেকেই আগ্নেয়গিরি থেকে বের হওয়া গ্যাসগুলির পরিমাণকে দায়ী করেন। কিন্তু এটা অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণের একটা।

রোহন : আর বাসে যে আলোচনা হচ্ছিল - সূর্যের গতিবিধি পরিবর্তন, সাগরের জলপ্রবাহের পরিবর্তন... এগুলো তো দায়ী হতে পারে.. নাকি ?

অবনী : একদম ঠিক। পৃথিবী ভর্তি এই সমস্ত পাহাড় পর্বতগুলো কতবার উচ্চতায় বেড়েছে বা কমেছে। এতেই তো হাওয়ার আর সাগরের জলের গতিবিধির পরিবর্তন বেশ হবে। এছাড়াও আরো অনেক থিওরি রয়েছে। বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে।

নেহা : আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের মুখে জলবায়ু আর জলবায়ুর পরিবর্তন - এই সব শুনছি। কেউ কি একটু বলবে জলবায়ু ব্যাপারটা কী ?

রাজা : আমি বলছি। তুই কি জানিস আবহাওয়া কি ?

নেহা : হ্যাঁ----। টিভিতে বলে তো। আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ খবর। ওখানেই তো দেখি। কখন বৃষ্টি হবে আর কখন হবে না ...এইসব।

রাজা : ঠিক বলেছিস। টিভিতে প্রত্যেকদিন পরের দিনের কী আবহাওয়া হতে পারে তার একটা সম্ভাবনা দেয়। ওরা তোকে বলবে তাপমাত্রার ব্যাপারে, মেঘ কত আছে তার ব্যাপারে, আদ্রতা ঝড়-বৃষ্টি হিজিবিজি ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হলো আবহাওয়ার খবর। আমাদের বায়ুমন্ডলে প্রত্যেকদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার একটা মিশেল ব্যাপার হলো আবহাওয়া।

অবনী : কিন্তু মনে রাখবে, সব জায়গার আবহাওয়া সমান নয়। কোথাও গরম এবং রোদ ঝলমলে আবার পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কোথাও হয়তো প্রচন্ড ঠান্ডা, মনে এক্কেবারে জমিয়ে দেবার মত।

নেহা : আচ্ছা। কিন্তু জলবায়ু ?

মালা : আবহাওয়া বুঝেছিস। জলবায়ুটাও সোজা। আবহাওয়া হল আমরা প্রত্যেকদিন আমাদের চারপাশটাকে যেভাবে দেখছি আর অনুভব করছি। হতে পারে একদিন বৃষ্টি হলো, আবার পরের দিন চড়া রোদ উঠল। কিন্তু জলবায়ু হল কোন একটা জায়গার গড়পড়তা আবহাওয়া। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ু বিভিন্ন হতেই পারে। হতে পারে কোন একটা জায়গা গরমকালের বেশিরভাগ সময় গরম এবং শুষ্ক থাকে। ওই একই জায়গা আবার শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা আর আদ্র হতে পারে। তুই এমন কোন জায়গায় থাকতেই পারে যেখানে সারাক্ষণ বরফ পড়ছে।

গীতা : পৃথিবীরও আবার একটা জলবায়ু রয়েছে। এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের জলবায়ুকে এক জায়গায় করলে এর ধারণাটা পাওয়া যায়।

নেহা : দাঁড়াও দাঁড়াও। সব কেমন ঘেঁটে গেল। একটা জায়গার আবহাওয়া যদি প্রত্যেক দিন বদলাতে পারে তাহলে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে লোকজন এত মাথা খারাপ করছে কেন ? জলবায়ু পরিবর্তনটা আসলে কী ?

মালা : ওই যে বললাম..... জলবায়ু হল কোন একটা জায়গার গড়পড়তা আবহাওয়া। যেমন ধরতে পারিস কোন এক জায়গায় সারা বছর মোট কত বৃষ্টি হয়... বা সেই জায়গার তাপমাত্রা একটা গোটা ঋতুতে বা কোন এক মাসে কেমন ভাবে বদলায় তার হিসাব... এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপার... এখানে একটা বা দুটো দিন নিয়ে কথা হবে না... হবে অনেক দিনের আর বেশ অনেকটা বড় এলাকার ওই সমস্ত হিসাব নিয়ে।

নেহা : পৃথিবীর জলবায়ু কি বদলে যাচ্ছে ?

রোহান : পৃথিবীর জলবায়ু সব সময় বদলায়। অতীতে কোনো এক সময় পৃথিবীর জলবায়ু এখনকার থেকে গরম ছিল। আবার কোন এক সময় এখনকার থেকে অনেক ঠান্ডাও ছিল। আর এই মুহূর্তগুলো এক দুই বছরের জন্য নয়.... অনেকদিন ধরে স্থায়ী থাকে। আর এই পরিবর্তনগুলো হতেও সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বছর।

রাজা : কিরে ! খাবারের থেকে চোখ সরানোর সময় হল তোর !? হে হে । পেট ভরেছে বাবুসোনা (মজা করে)।

রোহন : নিজের খাবারে মন দাও না !

রাজা : আরে খেপিস না। মজা করছি। যাই হোক, কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম ? ও হ্যাঁ... পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা বলছে পৃথিবী নাকি আস্তে আস্তে আরো গরম হচ্ছে। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেড়ে গেছে। তোর মনে হতেই পারে যেটা খুব ছোট্ট একটা বদল। এতে আর কিই বা হবে। কিন্তু এর প্রভাব অনেক বেশি ।

নেহা : বাপরে !

গীতা : হুমমমম ... এবং তার কিছু প্রভাব এখনই ঘটে চলেছে। প্রচুর পরিমাণে মেরু দেশের হিমবাহের বরফ গুলে গলে যাচ্ছে। এর ফলে বহু পশু আর বরফ অঞ্চলের অন্যান্য প্রাণীদের জীবন খুবই সংকটে। বেশকিছু গাছপালার বেড়ে ওঠার সময়েরও পরিবর্তন হয়ে গেছে।

রোহন : স্যার খানিক আগে যা বলছিলেন। এসবের পেছনে অনেক থিওরি রয়েছে। প্রত্যেকে একটা অন্য কারণ দিয়ে এই সব ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মজার ব্যাপার, সকলেই একই ফলাফল বাতলায়। এর মধ্যেই আমার সব থেকে ইন্টারেস্টিং থিওরি লাগে ওই তুষার যুগের ব্যাপারটা।

গীতা : তুষার যুগের ব্যাপারটা কিরকম ?

অবনী : বলছি বলছি। তার আগে সবার যখন খাওয়া হয়ে গেছে চটপট বাসে উঠে পড়ো। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।

(সকলে বাসে উঠতে লাগলো.. পায়ের শব্দ)

অবনী : সবাই উঠেছ ?

সবাই একসাথে : হ্যাঁ ---- স্যা--র..

অবনী : হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম ? তুষার যুগ ! অনেক বছর ধরে যদি পৃথিবীর বুকের আর তার উপরের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে, যার ফলে মেরুদেশের বরফের চাদরগুলো আর আল্পীয় হিমবাহগুলো বেশ লম্বায় ও চওড়ায় বড় হয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে তখন সেই সময়টাকে বলা হবে তুষার যুগ।

নেহা : তার মানে সব জায়গায় বরফ ? তার মানে যখন চাইব তখনই আইসক্রিম খেতে পাব ? আরিব্বাস !! কি মজা !!

রাজা : কিন্তু নেহা, এই ঠান্ডা কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডা ! তখন কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে আর স্কুলে যেতে হবে।

নেহা : না ! না ! তাহলে আমি তুষার যুগও চাই না আর আইসক্রিমও চাই না ।

রাজা : হা হা হা হা।

গীতা : কেন শুধু শুধু ওর পেছনে লাগছিস ?

মালা : কতগুলো তুষার যুগ এসেছে, স্যার ?

অবনী : পৃথিবীর ইতিহাসে অন্তত ৫ টা বড়োসড়ো - হুরোনিয়ান, ক্রায়োজেনিয়ান, অ্যান্ডিয়ান-সাহারান, কারু, আর কোয়াটারনারি তুষার যুগ। এই সমস্ত সময়গুলোর বাইরে পৃথিবীতে অনেক উঁচু জায়গাগুলোতেও কোন বরফ ছিল না।

রাজা : এই সমস্ত যুগগুলোর সময়সীমা কতটা ?

অবনী : সবার প্রথম যে তুষার যুগ সেই সময়ের পাওয়া পাথর গুলো আজ থেকে প্রায় ২৪০ থেকে ২১০ কোটি বছর পুরনো।

গীতা : আর তারপরেরটা ?

অবনী : ৮৫ থেকে ৬৩ কোটি বছর। এইটে শত কোটি বছরে সব থেকে মারাত্মক তুষার যুগ।

নেহা : কেন বাবা ?

অবনী : এই সময় পৃথিবীটা একদম একটা বরফের বলের মতো হয়ে গেছিল। বরফের চাদর প্রায় নিরক্ষরেখার কাছে চলে এসেছিল।

নেহা : কি ভয়ানক !

অবনী : হুম। তবে আর বলছি কী ! তবে চার নম্বরেরটা, মনে ওই কারু তুষার যুগ... এইটা আমার কাছে সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং...

মালা : কেন স্যার ?

অবনী : পৃথিবীর স্থলভাগে এই সময় গাছপালা বেড়ে উঠছিল.... আর তাতে করে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায় আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড অনেক কমে যায়... যার ফলে এই তুষার যুগ শুরু হয়.. দক্ষিণ আফ্রিকায় কারু অঞ্চলে প্রথম এর প্রমাণ পাওয়া যায়... সেই জন্যই এই তুষার যুগের অমন নামকরণ..

মালা : বেশ দারুন ব্যাপার ! কিন্তু স্যার এই তুষার যুগ কেন আসে ?

অবনী : এর ব্যাখ্যা আজও অবধি সম্পূর্ণ ভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। হতে পারে এত লম্বা সময় ধরে চলা তুষার যুগের জন্য... অথবা এর পরবর্তীকালে হিমবাহগুলোর খুবই অল্প প্রবাহের জন্য তুষার যুগ আসার কারণ সেই ভাবে ব্যাখ্যা করে ওঠা যায়নি। তবে অনেকগুলো দিক রয়েছে এগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার - যেমন, আমাদের বায়ুমন্ডলের গঠন, এর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেনের ঘনত্ব ইত্যাদি। আর আগে তো আমি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করলামই। সেগুলোও এখানে আছে।

নেহা : তার মানে এই সব জায়গায় গবেষণা আর আবিষ্কারের আরো অবকাশ আছে বলছো ?

অবনী : নিশ্চয়ই। ইন্টারেস্ট থাকলে পরে এই নিয়ে পড়াশোনা করতে পারিস। প্রত্যেকটা তুষার যুগের শুরুর দিকে গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলোর পরিমাণ বাতাসে কমে যায়। আর ঠিক শেষের মুখে বেড়ে যায়। এরও কোন ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করা খুব শক্ত কাজ।

মালা : আচ্ছা স্যার, এগুলোর ওপর কি মানুষের ক্রিয়া-কলাপের কোনো প্রভাব আছে ?

অবনী : নিশ্চয়ই আছে। গত ১০০ থেকে হাজার বছরের মধ্যে মানুষের কাজকর্মের প্রভাব পরিবেশের উপর সব থেকে বেশি পড়েছে। অত্যাধিক জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে আমাদের বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস প্রচন্ড রকম বেড়ে গেছে। যা আরও বেশি করে সূর্যের তাপকে ধরে রাখছে। ২০১২ সালের একটা খোঁজ থেকে জানা যায় যে আজ মানুষ তার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের জন্য বাতাসে যে পরিমাণ মিথেন গ্যাস ছাড়ছে আদিম ডাইনোসরেরা তাদের পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় তত পরিমাণই মিথেন গ্যাস বায়ুতে ছাড়তো। হয়তো ১৫ কোটি বছর আগে এই কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়েছিল...

রাজা : আমাদের মহাদেশ গুলোর অবস্থান অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে।

গীতা : কিভাবে ?

রাজা : আমাদের সমস্ত ভৌগোলিক রেকর্ড থেকে জানা যায় যে তুষার যুগ যখন শুরু হয়েছিল সেই সময় আমাদের মহাদেশগুলোর অবস্থান এমন ছিল যে বিষুব অঞ্চল থেকে গরম জলের প্রবাহ মেরু অঞ্চলে যেতে পারত না... আর যার ফলে ওখানকার বরফের চাদরগুলো আরো পুরু এবং বড় হতে শুরু করে... বেড়ে ওঠা এই বরফের চাদরগুলো পৃথিবীর তরফ থেকে সূর্য থেকে আসা তাপশক্তির প্রতিফলন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়... এই জিনিসটা পৃথিবীর সৌরশক্তি শোষণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়..

গীতা : তারপর কী হলো ?

রাজা : তারপর আর কী ! কম তাপ শোষণ মানে বায়ুমণ্ডল সমেত সবকিছু ঠান্ডা হতে শুরু করল। পরিণতি তুষারযুগ। এটা ততক্ষণ চলল যতক্ষণ না আবার কোনো কারনে গ্রীনহাউজ প্রভাব বাড়ল।

রোহন : আমাদের আজকের পৃথিবীতে কিন্তু একটা মহাদেশ আছে যার পুরোটা দক্ষিণ মেরুতে। একটা এমন সাগর রয়েছে উত্তর মেরুতে যার পুরোটা স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা। এরকম আরো বেশ কিছু জিনিসের অবস্থানগত কারণে ভূতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা আবার তুষার যুগের মুখোমুখি হতে পারি।

রাজা : আবার এমন অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা বিশ্বাস করেন হিমালয়ের মতো পর্বত গুলোর জন্য পৃথিবীতে মোট বৃষ্টিপাত অনেক বেড়েছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডও ধুয়ে যাচ্ছে বাতাস থেকে ....ফলে এর কারনেও তুষার যুগ অবশ্যম্ভাবী।

নেহা : তারমানে গ্রীন হাউজ প্রভাব পৃথিবীর উপকারও করে।

রোহন : হ্যাঁ, সব কিছুরই ভালো আর খারাপ দিক রয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুরই অতিরিক্ত ব্যাপারটা ঠিক নয়।

নেহা : আমি এতক্ষণ ধরে পৃথিবীর বরফে ঢেকে যাওয়া আর তুষার যুগ নিয়ে অনেক কথা শুনলাম। এবার কেউ আমাকে বলো এসবের প্রভাব কী হতে পারে ?

মালা : আরে বাহ ! ভেরি গুড । দেখো, যদিও গত হিম যুগ শেষ হয়েছে আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছরেরও আগে, তবুও এর প্রভাব আজও আছে।

গীতা : এই যেমন কানাডা, গ্রীনল্যান্ড, উত্তর ইউরেশিয়া, আন্টার্টিকা - এইসব জায়গা থেকে যে চলমান বরফগুলো কেটে বেরিয়ে আসছে এগুলো তারই উদাহরণ।

রোহন : এই বরফের চাদরগুলোর ওজন এত বেশি ছিল যে পৃথিবীর উপরের স্তরকে তুবড়িয়ে চেপে রেখেছিল। যত দিন যাচ্ছে এই বরফ আস্তে আস্তে গলছে। আর তার সাথে সাথে এই তুবড়ে থাকা পৃথিবীপৃষ্ঠ আস্তে আস্তে নিজের আকৃতি ফেরত পাচ্ছে। বছরে প্রায় ১ সেন্টিমিটার করে।

গীতা : বরফ জমার সময় পৃথিবীর উপরে যত সমুদ্র রয়েছে, সাগর রয়েছে - সব জায়গার জল ওই বরফ তৈরিতে জমা হয়। কলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিতলের উচ্চতা প্রায় ১১০ মিটার কমে যায়। এর ফলে মহাদেশ

গুলোর অন্তর্বর্তী কিছু ভূ-ভাগ সমুদ্রের উপরে জেগে ওঠে। ফলে বিভিন্ন পশু সহ অনেক প্রাণী এই মহাদেশ থেকে ওই মহাদেশ যেতে পারে।

অবনী : হ্যাঁ। এইবার বরফ গলার পালা চলছে। বরফ হয়ে জমে থাকা সমুদ্রের জল আবার সমুদ্রে জলে ফেরত যাচ্ছে। যার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠ আবার উপরে উঠে আসছে। আবার কিছু স্থলভাগ জলের তলায় চলে যাবে। সমুদ্রের লবণাক্ততার হেরফের হবে। স্থানীয় আবহাওয়ার বিপুল পরিবর্তন হবে। অনেক কিছু ঘটতে পারে।

নেহা : বাবা, আমার ক্লাস টিচার বলছিল যে যখন পৃথিবী অনেক ঠাণ্ডা ছিল তখন এখানে নাকি কিছু লোমশ ম্যামথ ছিল ? লোমশ ম্যামথ কী বাবা ?

মালা : এরা আমাদের আজকের হাতিদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু এরা আজ অবলুপ্ত। তবে গত তুষার যুগের সময় এরা পৃথিবী চড়ে বেরিয়েছে। হয়তো পৃথিবী যখন গরম হচ্ছিল তখন এই পরিবর্তিত আবহাওয়া আর টিকে থাকতে পারেনি।

রাজা : মানুষের শিকারের কারণে ওরা অবলুপ্ত হতে পারে।

অবনী : ম্যামথ কথার আক্ষরিক অর্থ হলো বিশালাকায়। তখনকার ম্যামথ আমাদের এখনকার আফ্রিকান হাতিদের মতো আকারে ছিল। কানগুলো অবশ্য ছিল অনেক ছোট। তখনকার প্রবল শীতের হাত থেকে বাঁচতেই এরকমটা হয়ে যেতে হয়েছে তাদের।

রোহন : কলকাতার আন্তর্জাতিক জাদুঘরে গেলেই এদের কঙ্কাল দেখতে পারবি। আমার তো দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। এদের দাঁতগুলো প্রায় ৫০ ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছিল। ঘাস পাতা ফুল খেয়েই থাকত। শাকাহারী কিনা !

নেহা : আর কখন এরা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি চলে গেল ?

অবনী : যদিও আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে এই সমস্ত লোমশ ম্যামথদের বেশিরভাগই অবলুপ্ত হয়ে যায়, তবুও ৫০০ থেকে ১০০০ টি ম্যামথের একটি জনগোষ্ঠী রাঙ্গেল দ্বীপে ১৬৫০ খ্রিস্টপূর্ব অবধি ছিল। যা আজ থেকে মাত্র চারহাজার বছর আগেকার কথা!

মালা : এত বড় প্রাণীদের অবলুপ্তির সঠিক কারণ আজও আমরা জানি না। তবে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন আর মানুষের দ্বারা মাংস আর লোমের জন্য এদের শিকারকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নেহা : খুবই দুঃখের ব্যাপার। মানুষেরা শুধু মাংস আর লোমের জন্য এত বড় প্রাণীদের মেরে ফেলল !

মালা : কিন্তু আশ্চর্যভাবে মানুষটা এদের ভালোও বাসতো। নব্য প্রস্তর যুগের শিল্পীরা এদের ছবি অনেক জায়গায় এঁকে গেছে। ইউরোপীয় গুহাগুলোতে এইরকম অনেক ছবি রয়েছে।

রাজা : পৃথিবীতে যখন জলবায়ুর এইরকম দোদুল্যমানতা দূর হয় আর মোটামুটি একরকম শান্ত পরিবেশ তৈরি হয় তখন থেকেই মানুষের সভ্যতার বিকাশ হতে শুরু করে। আমরা পৃথিবীতে যত সময় ধরে আছি, মানুষের সমৃদ্ধ সভ্যতার সময়কাল তার মাত্র ৬ শতাংশ সময়ের।

অবনী : যাই হোক। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা, আলোচনা হল। রোহনের আবার নিশ্চয়ই একটু একটু খিদে পাচ্ছে। না কি, রোহন ?

নেহা : হ্যাঁ বাবা, রোহন দাদাকে এক্ষুনি কিছু খেতে দাও। না হলে দাদা এক্ষুনি লোমশ ম্যামথ গুলোর মত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। হে হে।

রাজা : আজ দারুন আলোচনা হল, স্যার। তুষার যুগ আর জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে অনেক ডাউট আজ ক্লিয়ার হয়ে গেল। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

নেহা : এতক্ষণ ধরে বরফ নিয়ে এত কথা শোনার পর আমাদের কি আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয় ? আমি কি ঠিক বলছি বাবা?

(সবাই হেসে উঠল)